এর পরে যথাক্রমে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। কিন্তু সৃষ্টির প্রায় এক লক্ষ বছর পর্যন্ত আমরা যাকে জড়পদার্থ বা ম্যাটার বলি সেরকম কিছুই তৈরি হয়নি। তখন আসলে রঞ্জন রশ্মি, আর বেতার তরঙ্গের মতো লম্বা দৈর্ঘ্যের অতি তেজী রশ্মিসমূহ বরং জড়ের উপর রাজত্ব করছিল। নিউক্লিয়াস থেকে পরমাণু ও অনু এবং পরে মুক্ত ইলেকট্রন তৈরি হতে আসলে আক্ষরিক অর্থেই বিস্তর সময় লেগেছিল। আর তারপরই কেবল তেজস্ক্রিয় রশ্মিসমূহের উপর জড়-পদার্থের আধিপত্য শুরু হয়েছে। এরপর আরও বিশ কোটি বছর লেগেছে গ্যালাক্সি জাতীয় কিছু তৈরি হতে। আর আমাদের যে গ্যালাক্সি, যাকে আমরা নাম দিয়েছি ছায়াপথ বা 'মিল্কিওয়ে' (Milky way), সেখানে সূর্যের সৃষ্টি হয়েছে আজ থেকে প্রায় পাঁচশত কোটি বছর আগে। আর সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণমান গ্যাসের চাকতি থেকে প্রায় ৪৫০-৪৬০ কোটি বছরের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ খচিত আমাদের পরিচিত সৌর জগৎ (Solar system)।

এই হচ্ছে সাদা-মাঠাভাবে আমাদের দৃশ্যমান বিশ্বজগৎ সৃষ্টির ইতিকথা। 'সাদা-মাঠা' শব্দটি ইচ্ছে করেই এখানে ব্যবহার করা হলো, কারণ এই আশ্চর্য সৃষ্টি-রহস্যের (বিশেষ করে প্রথম কয়েক মিনিটে কি ঘটেছিল) পেছনে লুকিয়ে আছে আসলে কতকগুলো ধারণা আর ভারী ভারী তত্ত্বকথা, যার অনেক কিছুই এখনও খুব পরিষ্কার নয়, নানা মুনির নানা মত। তবে বেশিরভাগ খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী এখন অন্তত একটি বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, 'বিগ-ব্যাং' বা প্রচ বিস্ফোরণ বলে একটি কিছু সত্যিই ঘটেছিল। কীভাবে তারা সেটি বুঝলেন ? বুঝলেন সেই হাবলের আবিষ্কার থেকে, যা নিয়ে আমরা এর আগে আলোচনা করেছি। পাঠকদের অনেকেই অবশ্য বলতে পারেন যে, হাবলের আবিষ্কার তো মহাবিশ্বের প্রসারণের কথাই শুধু বলেছে, মহা বিস্ফোরণের কথা তো নয়। হ্যাঁ, তা ঠিকই, তবে হাবলের আবিষ্কারের পর মহাবিস্ফোরণের পক্ষে সবচেয়ে জোড়ালো সাক্ষ্য পাওয়া গেছে ১৯৬৪ সালে মহাজাগতিক পশ্চাদপট বিকিরণ অর্থাৎ 'কসমিক ব্যাক গ্রাউন্ড রেডিয়েশনের' (cosmic back ground radiation) অস্তিত্ব থেকে।

এ বিষয় সম্পর্কে কিছু বলতে হলে প্রথমে জর্জ গ্যামোর (George Gammow) কথা বলে নিতে হবে। বিগ-ব্যাং ধারণার প্রাথমিক কৃতিত্ব কিন্তু অবশ্যই এই কৃতী পদার্থ বিজ্ঞানীর, যার বিস্ময়কর প্রতিভার স্পর্শ পদার্থবিদ্যার নানা শাখায় ছড়িয়ে রয়েছে। রুশ দেশের এই রসিক আর খেয়ালী বিজ্ঞানী, যিনি আবার শখের যাদুকরও ছিলেন, প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে একক চেষ্টাতেই বলা যায় 'বিগ-ব্যাং'র ধারণাকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

স্ট্যালিনের আমলের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে গ্যামো রুশদেশ থেকে পালিয়ে এসে যোগ দিয়েছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এসময় (১৯৪০) গ্যামোর অধীনে পিএইচ. ডি করার উদ্দেশ্যে রালফ আলফার নামে জনৈক মেধাবী গ্র্যাজুয়েট ছাত্র ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন। তখনই আলফারের সাথে কাজ করতে গিয়ে 'বিগ-ব্যাং'র ধারণা গ্যামোর মাথায় আসে। হাবলের আবিষ্কারের সাথে তিনি পরিচিত তো ছিলেনই। আরেকটি বাড়তি চিন্তা করাতেই তার মাথায় এল, যদি তাই হয়, তবে সমগ্র মহাবিশ্ব নিশ্চয়ই একটি মাত্র বিন্দু থেকে এক সময় উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল, যাকে আমরা বর্তমানে বিগ-ব্যাং প্রতিভাস নামে অভিহিত করছি। এ ধারণাটির উৎপত্তির পেছনে আরেকজন ব্যক্তির অবদানের কথা উল্লেখ না করলে তার প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি হলেন লেমিত্রি (Georges-Henri Lemaitre), বিগ ব্যাং প্রতিভাসের আর একজন প্রবক্তা- যিনি ছিলেন একাধারে পদার্থবিজ্ঞানী এবং সেই সাথে ধর্মজাযক। তবে লেমিত্রি বা গ্যামো কেউ নিজে থেকে বিগ ব্যাং শব্দটি চয়ন করেন নি।

গ্যামোর ধারণাকে খ ন করতে গিয়ে আর এক প্রখ্যাত তাত্ত্বিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক হয়েল (Frederick Hoyle) সর্বপ্রথম এই বিগ-ব্যাং শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। হয়েল ছিলেন বিগ-ব্যাং তত্ত্বের বিপরীতে স্থিতিশীল অবস্থা (steady state) নামে মহাবিশ্বের অন্য একটি জনপ্রিয় মডেলের প্রবক্তা। হয়েলের তত্ত্বের সাথে প্রথম দিকে যুক্ত ছিলেন কেম্ব্রিজ কলেজের হারমান বন্দি, থমাস গোল্ড আর পরবর্তীকালে একজন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী, তার নাম জয়ন্ত নারলিকর। ১৯৪০ সালে একটি রেডিও প্রোগ্রামে হয়েল গ্যামো আর তার অনুসারীদের ধারণাকে খ ন করতে গিয়ে বেশ কড়া সুরেই বলেছিলেন, "হাঃ সেই 'উত্তপ্ত বিগ ব্যাং', - এই বিস্ফোরণের ধারণা যদি সঠিকই হবে, তবে তো এর ছাই-ভস্ম এখন কিছুটা থেকে যাওয়ার কথা। আমাকে 'বিগ ব্যাং' এর সেই ফসিল এরন দেখাও, তারপর অন্য কথা।' এরপর থেকেই বিগ-ব্যাং শব্দটি ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের জগতে স্থায়ী আসন করে নেয়।

সে যাই হোক, আলফারের পিএইচ. ডি'র শেষ পর্যায়ে আলফার ও গ্যামো যুক্তভাবে 'Physical Review' জার্নালের জন্য 'Origin of the Chemical Elements' শিরোনামে একটি গবেষণা নিবন্ধ লিখতে শুরু করলেন। আর এখানেই রসিকরাজ গ্যামো বিজ্ঞান জগতের সবচাইতে বড় রসিকতাটি করে বসলেন। জার্নালে ছাপানোর আগে তিনি তার বন্ধু আর এক স্বনামখ্যাত পদার্থবিদ হ্যানস বিথের (কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়, নিউইয়র্ক) নাম তাকে না জানিয়েই প্রবন্ধটির লেখক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। পরে কারণ হিসেবে বলেছিলেন," 'আলফার' আর 'গ্যামো' - এই দুই গ্রীক ধরণের নামের মাঝে 'বিটা' জাতীয় কিছু থাকবে না, এ হয় নাকি? তাই বিথেকে দলে নেওয়া!" আর সত্যিই ১৯৪৮ সালের ১ এপ্রিলে এই তিন বিজ্ঞানীর নামে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল, যা পরবর্তীকালে গ্যামোর রসিকতাকে সত্যি প্রমাণিত করে এখন 'আলফা-বিটা-গামা পেপার' (α–β–γ paper) নামেই বৈজ্ঞানিক মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু সেই প্রবন্ধটিতে কি বলেছিলেন গ্যামো? তিনি ধারণা করেছিলেন যে, একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে যদি মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে সেই ভয়ঙ্কর বিকিরণের কিছুটা স্বাক্ষর, অর্থাৎ বিকিরণ-রেশের এখনও কিছুটা বজায় থাকা উচিত। গ্যামো হিসেব কষে দেখালেন যে, সৃষ্টির আদিতে যে তেজময় বিকিরণের উদ্ভব হয়েছিল, মহাবিশ্বের প্রসারণের ফলে তার বর্ণালী তাপমাত্রা হ্রাস পেতে পেতে এখন পরম শূন্য তাপমাত্রার উপরে ৫° ডিগ্রী কেলভিনের মতো হওয়া উচিত। এই তেজময় বিকিরণের অবশেষকেই বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন 'মহাজাগতিক পশ্চাদপট বিকিরণ' বা 'cosmic back ground radiation'। মহাশূন্যে এই বিকিরণের প্রকৃতি হবে মাইক্রো ওয়েভ (microwave) বা ক্ষুদ্র তরঙ্গ। সহজ কথায় বিষয়টি বুঝবার চেষ্টা করা যাক- আমরা মনে করতে পারি যেন সৃষ্টির আদিতে বিশ্বব্রহ্মা ছিল একটি উত্তপ্ত মাইক্রো ওয়েভ চুল্লি যা এখন ঠাণ্ডা হয়ে ৫ ডিগ্রী কেলভিনে এসে পৌঁছেছে। এই ব্যাপারটি পরীক্ষায় ধরা পড়ল ১৯৬৪ সালে আর্নো পেনজিয়াস আর রবার্ট উইলসনের পরীক্ষণে। পশ্চাদপট বিকিরণের তীব্রতা মেপে তারা গ্যামার ভবিষ্যদ্বাণীর বেশ কাছাকাছি ফল পেলেন - পরম শূন্যের উপর ৩ ডিগ্রী। এই আবিষ্কারের জন্য পেনজিয়াস ও উইলসন নোবেল পুরস্কার পান ১৯৭৮ সালে- গ্যামোর মৃত্যুর দশ বছর পরে। মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার প্রদানের কোন রীতি নেই, থাকলে গ্যামোকে চোখ বন্ধ করে বোধহয় তখন নির্বাচিত করা হতো, যিনি প্রায় একক প্রচেষ্টায় বিগ-ব্যাং'র ধারণাকে বিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বোধ হয় কিছু বৈজ্ঞানিক অবদান সবসময় থেকে যাবে যা নোবেল প্রাইজের চেয়েও বেশি দামি আর গুরুত্বপূর্ণ।

পেনজিয়াস ও উইলসনের বিখ্যাত 'মহাজাগতিক মাইক্রো তরঙ্গের পশ্চাদপট বিকিরণ' অর্থাৎ 'cosmic microwave back ground radiation' আবিষ্কারের পর তিন দশকেরও বেশি সময় কেটে গেছে। এই তো মাত্র ক'বছর আগে ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে নাসা তার গোদার্দ স্পেস ফ্লাইট সেন্টার থেকে 'Cosmic Background Explorer (COBE)' নামে একটি উপগ্রহ প্রেরণ করেছে। এবার কিন্তু সেই মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি নয়, বরং বেশ সংবেদনশীল যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিখুঁতভাবে পশ্চাদপট বিকিরণের অস্তিত্ব মাপার পরীক্ষণ সম্পাদন করা হল। ফলাফল ২.৭২৫ ± ০.০০২°K অর্থাৎ পেনজিয়াস-উইলসনের ফলাফলের সাথে বেশ মিলে গেল। সুতরাং গ্যামোর মহাবিস্ফোরণের তাত্ত্বিক ধারণা তাহলে সম্পূর্ণ সঠিক ছিল!◀